মহানবী ও শিশু

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

সূচিপত্র

মহানবী পরিবারের শিশু

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর শিশু নাতি-নাতনীদের অত্যধিক ভালবাসতেন। শুধু নিজের নাতি-নাতনী নয়, যে কোন শিশুকে কাছে পেলেই তিনি তাদেরকে সালাম দিতেন, পাশে বসাতেন, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, আদর আপ্যায়ন করতেন।

দৌহিত্রি উমামা

রাসুলুল্লাহর জৈষ্ঠ কন্যা জয়নবের (রাঃ) শিশু কন্যাকে রাসূল (সাঃ) অত্যধিক স্নেহ করতেন। জয়নবের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল তাঁর খালাতো ভাই আবুল আসের (রাঃ)-এর সাথে।

সাহাবী আবু কাতাদা (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ননা করেছেন। আমরা এক সময় মসজিদে নবুবীতে অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে তশরিফ আনলেন। কাঁধের উপর আসীন দৌহিত্রি শিশু উমামা।

সে অবস্থায়ই রাসূল (সাঃ) সালাতে দাঁড়ালেন। তিনি যখন রুকুতে যেতেন, তখন শিশু উমামাকে নামিয়ে দিতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন, তখন তাকে কাঁধে তুলে নিতেন। এভাবে তিনি পুরো সালাত আদায় করেন।

নামাজের সময়ও শিশুরা রাসূলের সঙ্গ ছাড়তে চাইতোনা। নামাজরত অবস্থায় সেজদাকালে হাসান-হুসাইন তাদের নানার পিঠে উঠে বসতেন।

হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ)

বিবি ফাতেমা (রাঃ) এর গৃহে রাসূল (সাঃ) গেলে তিনি হাসান ও হুসাইনকে দেখতে চাইতেন। গৃহে প্রবেশের সময় তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠতো। প্রথমেই তিনি বলতেন "যাও আমার বাচ্চাদের নিয়ে এসো।" বিবি ফাতেমা (রাঃ) শিশুদেরকে নিয়ে এলে মহানবী (সাঃ) তাদের শরীরের ঘ্রাণ নিতেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরতেন। হযরত হাসানের চেহারা ছিলো মহানবী (সাঃ)-এর অনুরূপ এবং খুবই সুন্দর।

একদিন রাসূল (সাঃ) মসজিদে নবুবিতে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন শিশু হাসান এবং হুসাইন মসজিদে ঢুকছে। দু'জনের পরিধানে ছিল লাল জুব্বা। প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা জুব্বা গায়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সাঃ) খুতবা

পড়া বন্ধ করে সামনে এগিয়ে এসে দু'জনকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সামনে বসিয়ে দিলেন।

বাংলাদেশের কোন মসজিদে কোন ইমাম যদি ইমামতির সময় তার আদরের নাতনীকে কাঁধে উঠায় আর নামায়– আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে ! ইমাম সাহেব যদি শিশু-নাতিদেরকে দেখে খুতবা বন্দ করে দেন, মুসল্লিগণ কি মনে করবেন ?

হুসাইনের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি

একদিন রাসূল (সাঃ) কোথাও কোন কাজে রওনা হয়েছেন। পথে দেখলেন শিশু হুসাইন (রাঃ) খেলা করছেন। তিনি তার দিকে অগ্রসর হলেন। শিশু হুসাইনও হাসতে হাসতে নানার দিকে এগিয়ে এলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। শিশু হুন্ধাইনও হাত বাড়িয়ে দিলেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাত ধরার আগেই হুসাইন (রাঃ) হাত টেনে নিয়ে সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ তাকে ধরার জন্য অগ্রসর হলেন। শিশু হুসেইন দিলেন দৌড়।

অকারণে যে কাজ আল্লাহ খুব পছন্দ করেন তার মধ্যে আছে শিশুদের দৌড়াদৌড়ি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দৌড়ে হুসাইন (রাঃ) ধরে ফেলেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন। তিনি পরম আদরের শিশু হুসাইনকে বুকে চেপে ধরে বলেছিলেন, 'হুসাইন আমার এবং আমি হুসাইনের'।

অল্প বয়স থেকেই শিশুদেরকে দৌড়াদৌড়ি করতে, লাফঝাপ দিতে, ক্লান্ত হতে অভ্যস্ত করাতে হবে। ঘরের মধ্যে আটকিয়ে বা বসিয়ে রেখে অলস করার চেয়ে বাইরে যত বেশী ঘুরাফিরা করবে; ততোই শিশু পরিশ্রমী এবং শ্রমমুখী হবে।

আত্ম-বিশ্বাস

শিশুরা বড়দের ন্যায় কাজ করতে পারে এবং কোন দিক দিয়েই অযোগ্য বা অকর্মন্য নয়– এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

বয়স্করা ক্লান্ত হয়। কিন্তু শিশুরা সহজে ক্লান্ত হয়না। তাদের দৈহিক শক্তি কম কিন্তু এনার্জি বেশী। সারাদিন হাটলেও তারা ক্লান্তিবোধ করেনা। দৌড়ানো তাদের স্বভাব। দৌড়াদৌড়িতে তারা অসুস্থ হয়না বরং শ্রমমুখী হবে।

দৌড়াদৌড়িতে ক্লান্ত শিশুর বিশ্রামের সর্বোত্তম স্থান হলো মায়ের কোল। তাতে তার ক্লান্তি অর্ধেক দূর হয়ে যায়। শিশুদের নির্দোষ খেলা এবং নির্মল হাসি আনন্দ দেখার চেয়ে আনন্দকর ও পবিত্র দৃশ্য জগতে আর কি আছে !

আনন্দের দৃশ্য

হাটুর উপর শিশুকে বসিয়ে আনন্দ দেয়া, তার ছোট মনের আকুতি শুনা, সে কি ভাবে আনন্দ উপভোগ করে তা দেখা এবং উপভোগ করা, তার জ্ঞান বা দেহ কি ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা দেখা বড়ই আনন্দদায়ক।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন টের পেলেই তাঁর শিশু নাতী হাসান এবং হুসাইন দৌড়ে আসতেন। তাদের একটি উদ্দেশ্য থাকতো উটের পিঠে চড়া, রাসূল (সাঃ) দু'জনকেই উটের পিঠে তুলে নিতেন। একজন সামনে একজন পিছনে। কিছুক্ষণ চলার পর তিনি উট থেকে নামতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন কে আগে নামতে চায়। দু'জনই একসাথে আগে নামতে চাইতো। তিনি একজনকে আগে নামালে অন্যজন গোস্বা করতো। প্রথম জনকে পুর্ণরায় তিনি উটের পিঠে তুলে দিতেন। দ্বিতীয় জনকে প্রথমে নামাতেন। তারপর প্রথমজনকে নামাতেন। দ্বিতীয় জন আবার বলতো আমি আরেকবার উঠবো– এভাবে তিনি তাদেরকে আনন্দ দিতেন।

আদরের কাঙাল

শিশুরা আদরের কাঙ্গাল। ঘুম ভাঙ্গলেই কোলে উঠে আদর চায়। গভীর নিশীথেও পিতা-মাতার আদর-সোহাগের প্রত্যাশা করে। বুকে উঠে আদর-সোহাগ আদায় করে। শিশুকালে যে আদর পেয়েছে, তার হৃদয় নাড়া দিলে কিছু ফল পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

শিশুর অনুভুতি, ভালোবাসা, আদর সব কিছুই খাঁটি। শিশুদের দৌড়-ঝাপ লাফালাফি, হট্রগোল উপভোগ করার দৈর্য ও মানসিকতা আমাদের অনেকের থাকেনা। যেমন বাগান বা ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করার ক্ষমতা অনেকের হয়না।

শিশু হলো বেহেস্তের দূত ফিরিস্তাতুল্য, নিষ্পাপ। ঘরে শিশু থাকা মানে ফিরিস্তা থাকা। মানব শিশু প্রতিপালন করা মানে আল্লাহর ফিরিস্তা প্রতিপালন করা।

আদমের অনুলিপি

আদমেরই উত্তরসুরী হলো মানুষ। তাই উত্তরসুরী মানুষে হতে হবে পূর্বসূরী আদমের গুনে গুণান্বিত। মানবজীবন আদমের জীবন ও আদর্শের রূপায়ন। আদম সন্তানের চরিত্রে আদমের রূপই প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

জন্মের পর শিশু হৃদয় থাকে পবিত্র, কোমল ও পরিচ্ছন্ন যেন সাদা কাগজ। এর মাঝে কোন কালির দাগ তখনও পড়েনি। কিন্তু ক্রমশঃ এই সাদা বইটি মসীলিপ্ত হয়ে যায়। তবে মসিতে

মহাগ্রন্থও রচিত হতে পারে অথবা কালো কালিতে ভরা পড়ার অনুপযোগী বর্জ্য কাগজের চোথাও হতে পারে।

শিশুরা সুখী। কারণ তারা কোন পাপ করেনা। কোন পাপ তাদের হৃদয়কে কলুষিত এবং জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলেনা।

মানুষের মাঝে এমন কি আছে যা পবিত্র এবং আল্লাহ যার দিকে তাকিয়ে তার নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে আনন্দিত হন ? আল্লাহ দেখে খুশী হন এবং প্রত্যেক মানবগৃহে যা থাকতে পারে এবং থাকে তা হলো মানব শিশু। শিশু পরিছন্ন, নিষ্পাপ। আল্লাহর কাছে আনন্দদায়ক। তারা তখনও জান্নাতের দ্বার প্রান্তে। জান্নাতের ফিরিস্তারা শিশুদের দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হন। তাদের দেখে জান্নাতের পথভ্রষ্ট শিশু বলে ফিরিস্তাদের মনে হয়।

শিশুরা যখন আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে, তাদের সরল বিশ্বাস এবং পবিত্র মুনাজাত আল্লাহ শ্রবন করেন। তাদের সাথে সাথে ফিরিস্তারা আমীন আমীন বলে থাকেন।

শিশু প্রিয় নবী মুহাম্মদ (দঃ)

শিশুদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহের (সাঃ) ব্যবহার ছিল স্নেহপূর্ণ, কোমল এবং বন্ধুসুলভ। তিনি তাদের হাসি আনন্দে যোগ দিতেন। ছোটদের চপলতায় তিনি কখনও অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হতেন না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন।

বড়রা সাধারণত শিশুদের কথা মন দিয়ে শোনেনা। হা, হু, করে যায়। শিশুরা কিন্তু তা বুঝতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন বলে তারা তাঁকে ছাড়তে চাইতোনা।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে পথ চলছিলাম। পথের পাশে একদল ছেলে খেলা করছিলো। রাসূল (সাঃ) তাদের কাছে থেমে গেলেন এবং সালাম জানালেন। পথ চলার সময় অন্যদেরকে বিশেষ করে শিশুদেরকে সালাম জানানো নবী করিমের অভ্যাস ছিলো।

সাহাবী জাবের বিন সামুরা (রাঃ) তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনার বর্ণনা দেন। ছোট সময় তিনি একদিন রাসুলুল্লাহর (সাঃ) পেছনে সালাত (নামাজ) আদায় করছিলেন। সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরের দিকে রওনা হন। জাবের বিন সামুরাও পিছে পিছে তাঁকে অনুসরণ করেন।

কিছুপথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ একদল শিশু এসে রাসূলকে (সাঃ) ঘিরে ধরলো। জাবের বিন সামুরাও (রাঃ) তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রাসূল (সাঃ) সব শিশুকে আদর করলেন। হাত মুসাফা করলেন, মাথায় হাত বুলালেন এবং জাবের বিন সামুরাকেও আদর করলেন।

শিশুদেরকে দেখাবার জন্য আনয়ন

সাহাবীরা তাঁদের নিজ এবং আত্মীয় শিশু সন্তানদেরকে দেখানোর জন্য রাসূলের কাছে নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। নিজের মুখে খেজুর চিবিয়ে ছোট শিশুদের মুখে দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন।

সাহাবিয়া উম্মে কায়েসের পুত্র

একদিন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) খাওয়ার জন্য বসেছিলেন। কিন্তু খানা তখনও শুরু করেননি। উম্মে কায়েস বিনতে মুহসিন (রাঃ) তাঁর শিশু পুত্রটিকে কোলে করে রাসূলের (সাঃ) সাথে দেখা করতে এলেন।

শিশুটিকে দেখে রাসূল (সঃ) খানা ছেড়ে তার দিকে এলেন। পরম আদরে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে খাবারের স্থানে গিয়ে বসলেন। শিশুটি নবীর আদর পেয়ে তাঁর কোলেই পেশাব করে ভিজিয়ে দিলো।

রাসূল (সাঃ) স্মিত হাসলেন। চেহারায় বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ পেলোনা। তিনি কিছু পানি আনার জন্য একজনকে বললেন। পানি আনা হলে যে যে জায়গায় পেশাব পড়েছিল সেখানে তিনি পানি ঢেলে দিলেন। বাগানের ফুল যেমন পবিত্র, মায়ের কোল থেকে নেয়া শিশুও তেমন পবিত্র।

উটের পিটে দু'শিশু

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোনো সফর শেষে বাড়ী ফিরতেন তখন শিশু কিশোরদেরকে তিনি নিজ সওয়ারীর উপর তুলে নিতেন, তাদেরকে আগে-পিছে বসিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতেন।

একদিন দু'শিশু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উষ্ট্রির উপরে উঠে বসেছে। একজন তাঁর সম্মুখে, আর একজন পিছনে। যে শিশুটি সামনে বসেছিলো সে পিছনের শিশুটিকে লক্ষ্য করে বললো, আমি রাসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর সামনে বসেছি, তুই বসেছিস পিছনে।

পিছনের শিশুটিও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দু'হাত দিয়ে ধরে বলে উঠলো আমিতো নবীর গায়ের সঙ্গে মিশে আছি। সামনের শিশুটি তখন রাসূল (সাঃ)-এর বুকের দিকে হেলান দিয়ে বললো, আমি নবীর গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছি।

পিছনের শিশুটি তার ছোট্ট হাত দিয়ে রাসূল (সাঃ) কে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি রাসূল (সাঃ) কে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছি। সামনের শিশুটি এবার বলার জন্য কিছু পেলনা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার গায়ে হাত রাখলেন। শিশুটি আরো আনন্দিত হলো।

মদীনার শিশু কর্তৃক অভ্যর্থনা

হিজরতের পর মরু প্রান্তর অতিক্রম করে পথশ্রান্ত মহানবী (সাঃ) উপস্থিত হলেন মদিনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে। মদিনার নারী পুরুষ তাঁকে খোশ আমদেদ ও সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য স্থানে স্থানে ভীড় করছিলো। কেউ গাছের উপর উঠেও তাঁর উট দেখার চেষ্টা করছিলো। তিনি যে উটে চড়ে কুবা হয়ে মদিনায় প্রবেশ করেন তার নাম ছিল আল কাসওয়া।

একই উটে প্রিয় নবীর (সাঃ) পিছনে বসেছিলেন শ্রেষ্ঠ সাথী হযরত আবুবকর (রাঃ)। পথ দেখিয়ে এনেছিলেন আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত নামক একজন অমুসলিম। কাফিরদের ঘোষিত ১০০টি উট পাওয়ার লোভে তিনবার তাঁদের আক্রমণ করেছিল সুরাকা বিন মালিক।

কুবায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনি আম বংশের কুলসূম ইবনে হাদাম এবং সাদ ইবনে খাইসামার অতিথি ছিলেন। কুবায় প্রিয়নবী (সাঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করে মদিনায় যাত্রা করেন (বুখারী)। দিনটি ছিল শুক্রবার।

এদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কুবা পল্লী ত্যাগ করে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়ে বানুনা উপত্যকায় বনি সালেম ইবনে আওফ মহল্লায় তশরিফ আনেন এবং ঐ মহল্লায় জুমুয়ার নামাজ আদায় করেন। এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম জুমুয়ার নামাজ।

বনি সালেম মহল্লা থেকে রাসূল (সাঃ) মদিনার রওনা হন। মদিনাবাসীরা নবী (সাঃ) আগমনের খবর এর মাঝেই পেয়ে গিয়েছিলো।

মদিনার বয়স্ক নারী-পুরুষের সাথে শিশুরাও প্রিয় নবীকে (সাঃ) দেখার জন্য পথের পাশে ভীড় করেছিলো। 'আল্লাহু আকবার', রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসেছেন। 'আল্লাহু আকবার, মুহাম্মদ এসেছেন'। 'আল্লাহু আকবার, জান্নাতের নেয়ামত মদিনায় এসেছেন, শান্তির দূত আমাদের মাঝে এসেছেন'। এ সমস্ত কথা বলে তাঁর জন্য অপেক্ষমান জনতা আনন্দ প্রকাশ করছিলো।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) উটনী (কাসওয়া) বনি মালিক ইবনে আন নাজ্জারের দু'টি এতিম বালক সুহাইল ইবন আমার (রাঃ) এবং সাহল ইবনে আমারের (রাঃ) উট বাঁধার এবং খেজুর শুকাবার স্থানে বসে পড়েছিলো। সুহায়ল (রাঃ) ও সাহল (রাঃ) এর অভিভাবক ছিলেন আসাদ ইবনে জুবারা (রাঃ)। দশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে এ জমি ক্রয় করা হয়েছিল। মুদ্রা দিয়েছিলেন হযরত আবু বাকর (রাঃ)।

অন্যদের সাথে সাথে শিশুরাও বলছিলো "ইয়া মুহাম্মদ (সাঃ) সালামু আলাইকা", ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সালামু আলাইকা।" শিশুদের সমবেত সুললিত কণ্ঠধ্বনি মহানবীর (সাঃ) বেশ ভাল লাগলো। তাদের আনন্দে তিনিও আনন্দিত হলেন এবং উট থেকে তাদের কাছেই নেমে গেলেন। তাদের হাত ধরলেন, মাথায় হাত রাখলেন, চিবুক ধরে আদর করলেন।

অন্যদের সাথে সাথে বনি নাজ্জারের শিশু-কিশোরীরা কবিতা আবৃত্তি করে, রাসুলুল্লাহকে খোশ আমদেদ জানায়। তাদের কবিতার একটি বাক্য ছিলো– আমরা নাজ্জার গোত্রের মেয়ে, কি সৌভাগ্য আমাদের, মুহাম্মদ আমাদের প্রতিবেশী। রাসূলুল্লাহ আবু আইয়ুব নাজ্জারীর (রাঃ) আতিথ্য গ্রহণ করেন।

মহানবী (সাঃ) শিশুদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমাকে পছন্দ কর ? আমাকে ভালোবাস ? শিশুরা মহানন্দে জবাব দিলো, "অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। আমরা আপনাকে পছন্দ

করি। আপনাকে আমরা ভালোবাসি।" আল্লাহর রাসূলও (সাঃ) মধুর হাসি হেসে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমিও তোমাদেরকে পছন্দ করি। আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি।

মক্কার বনু হাশেম কবিলার শিশুদের আনন্দ

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মানুষকে ভালোবাসতেন, বিশেষ করে শিশুদেরকে, এ ভালোবাসার অনুভূতি তাঁর কথায় এবং বহু কর্মে প্রকাশিত হয়েছিলো। মহানবী (সাঃ) যখন মক্কায় হজ্জ করতে যান, মক্কার শিশুরাও তাঁর আগমণে আনন্দ প্রকাশ করেছিলো।

বনু হাশেম গোত্রের শিশুদের আনন্দ ছিল সবচেয়ে বেশি। একস্থানে তিনি নিজের উট থেকে নেমে যান এবং শিশুদেরকে উটে বসিয়ে দেন। তারা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর উটে বসে আনন্দ উচ্ছ্বাসে বিগলিত হয়ে উঠেছিলো।

নিষ্পাপ শিশু

শিশুরা ফিরিস্তাদের ন্যায় নিষ্পাপ। তারা কোনো ষড়যন্ত্র করে মানুষের ক্ষতি করেনা। অসৎ চিন্তা তাদের মাথায় আসেনা। তারা মানুষের মনে কষ্ট দেয়না। তাদের কষ্টে বড়দের মনে কষ্ট হয়। বড়রা তাদের নিরাপত্তা এবং হেফাজতের জন্যে বেশ উদ্বিগ্ন হন।

জন্মকালে কত দুর্বল ও অসহায় মানব শিশু। কিন্তু কালক্রমে হয়ে উঠে কত শক্তিশালী। শিশু ফুটন্ত গোলাপ নয়; গোলাপ কুঁড়ি। মনিমুক্তা প্রাণহীন। শিশু বেহেস্ত বিচ্যুত জীবন্ত মনিমুক্তা।

শিশুহীন ঘর

ঘর সাজাতে হলে শিশু প্রয়োজন। যতসব মূল্যবান আসবাবপত্র দ্বারাই গৃহ পূর্ণ করা হোক না কেন; একটি শিশু ঘরটিকে যত জীবন্ত, আনন্দময় এবং সুন্দর করে তোলে, অতি মূল্যবান আসবাবপত্র তার তুলনায় মূল্যহীন।

শিশু আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত। পরিবারে সন্তান এলে মানুষের মন উদার হয়। প্রশস্ত হয়। নিঃস্বার্থভাবে অন্যের জন্যে কিছু করার উত্তম প্রশিক্ষণের মাধ্যম হলো শিশু।

স্নেহ, ভালোবাসা, মমতারূপ মানবীয় গুণাবলী বিকাশ লাভ করে অপত্যস্নেহের মাধ্যমে। সন্তানের মাধ্যমে মানুষ দেশ, জাতি এবং সভ্যতায় অবদান রেখে যায়।

মহানবীর (সাঃ) শিশু প্রীতি

সাহাবী খালেদ বিন সাঈদের কন্যা

খালদে বিন সাইদ (রাঃ) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি রাসুলূল্লাহর (সাঃ) কাছে আসার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছেন। তাঁর ছোট মেয়েটি কান্না জুড়ে দিলো। সেও রাসুলূল্লাহর দরবারে যাবে। কন্যাকে খুশী করার জন্য খালিদ বিন সাঈদ (রাঃ) তাকে একটি লাল জামা পরিয়ে রাসূলের (সাঃ) কাছে নিয়ে আসলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছোট্ট শিশুটিকে দেখে খুশি হলেন। তার জামা কত সুন্দর, কি সুন্দর বলে তাকে বাহবা দিলেন। মেয়েটিকে রাসূল (সাঃ) কোলে বসালেন। মেয়েটি নবুওতি মোহর নামে খ্যাত রাসূলের ঘাড়ের গোস্ত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। জামার ভিতরে পিঠে হাত ঢুকিয়ে দিলো।

সাহাবী খালেদ বিন সাঈদ তা দেখে রাগ করলেন। মেয়েকে ধমক দিলেন। প্রিয় নবী তাকে শান্ত হতে বললেন এবং মেয়েটিকে বিরক্ত না করতে নির্দেশ দিলেন।

কোন উপলক্ষে রাসূলূল্লাহর কাছে একটি ছোট চাদর আসে। চাদরটির রং ছিল কালো। দুই পাশে ছিল সুন্দর আঁচল। চাদরটিতে ছিল লতা, পাতা, ফুল, ফলের বুনট। মহানবী (সাঃ) চাদরটি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন – চাদরটি কাকে তিনি দিবেন। সামনে বসা সাহাবীগণ চুপ রইলেন। তাঁরা কোন কিছু বললেননা, শুধু হাসলেন।

তাদের মনের ভাব হলো – আমরা কিছু বলবোনা। রাসূলের মন যাকে এই চাদরটি দিতে চায়, সেই এই চাদরটি যেন পায়। রাসুলূল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের মনের ভাব বুঝলেন। তিনিও হাসলেন। বললেন – কোন একজন গিয়ে খালেদ বিন সাঈদের মেয়েটিকে নিয়ে আসো।

সাথে সাথে খালেদ (রাঃ)-এর মেয়েটিকে আনা হলো, তার সঙ্গে মেয়েটির দাদিও এলো। রাসূল (সাঃ) মেয়েটির গায়ে কালো চাদর পড়িয়ে দিলেন। বললেন এটি পর। চাদরটি পরতে পরতে একেবারে পুরাতন করে ফেলো। মেয়েটি চাদর পেয়ে আনন্দে আটখানা।

চাদরে যে লতা-পাতা, ফুল-ফল ছিল, রাসূল (সাঃ) তা মেয়েটিকে দেখালেন। মেয়েটির দাদীকে বললেন দেখো দেখো খালিদের মা, "কত সুন্দর ! কি চমৎকার এই সুন্দর লতা-পাতা এবং বুনট।"

দু'টি কন্যার মা

একদিন হযরত আয়েশার (রাঃ) ঘরে একজন মেয়েলোক আসে। তার সাথে ছিল ছোট দু'টি মেয়ে। নবী গৃহে সে দিন অন্যদেরকে দেয়ার মতো কিছু ছিলোনা। বিবি আয়েশা (রাঃ) এ দিক, সে দিক তাকালেন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

ঘরের এক কোণায় দেখলেন মাটিতে একটি খেজুর পড়ে আছে। তা তুলে মুছে স্ত্রী লোকটিকে দিলেন। স্ত্রী লোকটি খেজুরটি দু'টুকরা করলো। নিজে না খেয়ে মেয়ে দু'টিকে ভাগ করে দিলো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে ফিরলে হযরত বিবি আয়েশা (রাঃ)-এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। নবী করিম (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ যে নারীকে সন্তানের প্রতি মমতা দান করেন, সে যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে"। (হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস ঃ বুখারী)।

শিশুর জন্যে কষ্ট করে মা আনন্দ পায়। বাবার মৃত্যুতে বয়স্কা মেয়ে কাঁদে। বিগলিত অশ্রুধারায় তার গাল ভিজে যায়। তার শিশু ছেলেটি কোলে লাফিয়ে পড়লে অর্ধেক ব্যথা দূর হয়ে যায়।

শিশুরা অল্পতে তুষ্ট। একটি চকলেট, একটু মিষ্টি পেলে কত খুশী হয়। সারাদিন সারা বাড়ীতে এবং আল্লাহর দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। তার নিজের প্রয়োজন ঘুমাবার জন্যে একটি ছোট্ট বিছানা।

বড়দের প্রয়োজন কতটুকু ? সারা দুনিয়াটা পেলেও পেট ভরেনা। মঙ্গল গ্রহটা তার দরকার হবে।

যে মা সারাটি জীবন তার একমাত্র সন্তানের ভালোবাসা এবং সেবায় নিয়োগ করে সেও বহু কাজ তার পুত্রের মাধ্যমে করাতে ব্যর্থ হয়। শিশু প্রপৌত্রটি নিজে না বলে বা না চেয়েও তার এক রোখা পিতাকে দিয়ে বহু কাজ করিয়ে নিতে পারে।

শিশু পুত্রের শুধুমাত্র প্রয়োজনের কথা ধাত্রী বলে দিলেও পিতা পুত্রের জন্যে এমন বহু কাজ করে থাকে, যা অন্য কোন ক্ষেত্রে সে করতে সম্মত হবে না।

কত মধুর, কত করুণাময় শিশু জীবন। ঐশ্বর্যশালী পিতা, শক্তিমান ভ্রাতা নয়, অসহায় দুর্বল শিশুই নারীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তি।

শিশুকালে মৃত জান্নাতি শিশুর মা-বাবা পাপ করতেও লজ্জা পাওয়া উচিত। কারণ তাদের পাপের কথা জেনে জান্নাতি শিশু অন্যদের কাছে লজ্জা পাবে।

জান্নাতী শিশুরা কি মা-বাবা কী অপরাধে কোথায় আছে তা খবর নিবেনা? আপন শিশুর মৃত্যু এক ধরণের সৌভাগ্য বলা যেতে পারে।

ক্ষুদ্র সাপের বাচ্চা বাড়ীতে রাখুন। ক্ষুদ্র হলেও ছোবল মারবে। বাঘের ক্ষুদ্র বাচ্চা প্রতিপালন করুন। মোরগের বাচ্চা পেলে কামড়াবে।

হাজারটি তিন বছরের মানব শিশু একত্র করুন। একটি আরেকটিকে কামড়াবে, থাপ্পর মাড়বে। কারণ এটা সমবয়সীদের প্রতি তাদের আদর প্রকাশের ভাষা।

নিজেরা অকারণে কাঁদে। নিজের ছোট ভাইটাকে অকারণে কাঁদিয়ে তামাশা দেখে। একটি দু'টি নয়, হাজার শিশুর মাঝেও হিংসা, ঘৃণা, জিঘাংসা দেখা যাবেনা। সবার মাঝে সরলতা, পাপহীনতা পবিত্রতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শিশুরা অযথাও কাঁদে। তাদের কান্না দেখে মায়ের হাসি পায়। এ দুনিয়ায় শিশুর অকারণ কান্না অপেক্ষা জান্নাতে গিয়ে মা-বাবার জন্যে কান্না অনেক উপকারে আসতে পারে। শিশুর কষ্টের কান্না হৃদয়-বিদারক।

ছোট শিশু মৃত্যুকে ভয় করেনা। মায়ের মৃত্যুতেও কাঁদেনা। মায়ের মুত্যু এবং ঘুমের মাঝে সে পার্থক্য করতে পারেনা।

তার অবচেতন মনে রয়েছে জীবনের স্বপ্ন। ছোট্ট শিশুও চোখ রাঙানোকে ভয় করে। ধমকে ভীত হয়। ছোট বেতকে ভয় করে, যদি একবার বেতের ব্যথা পেয়ে থাকে।

দৈহিক শাস্তি এবং ব্যথা মানসিক দুঃখ ও বেদনার তুলনায় এক কানাকড়িও নয়। তবে দৈহিক শাস্তি দিয়েই বা কি লাভ !

যদিও শিশু কাঁদে, মুহূর্তে ভুলে যায়। শিশু শারিরীক ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু তাদের জীবনে কোন দুঃখ নেই। শত অভাবের মাঝেও তাদের জীবন আনন্দময়।

বাবা মায়ের কৃত দোয়া ও স্নেহের ঐশ্বর্য থাকলে দারিদ্রতা তার সাফল্যের ধারা রুদ্ধ করতে পরেনা।

ফিরিস্তারা হুকুম ছাড়া কোন কাজ করতে পারেনা। কিন্তু মানুষ আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারে। মানব জীবনের লক্ষ্য ফিরিস্তা হওয়া নয়, ফলপ্রসু কল্যাণময় মানুষ হওয়া।

শিশুদের চোখে দেখা যায় বেহেস্তের দীপ্তি ও ঔজ্জল্য। এর মাঝে পাপের কোন স্পর্শ নেই। তাদের চোখ পাপ দেখলেও পাপের কারণ শিশু অনুভব করে না।

মানব প্রকৃতি অনুসারেই মানব শিশু বড় হয়ে উঠে প্রত্যেক শিশুর মাঝেই লুকায়িত থাকে মানবিক ও পাশবিক পদ্ধতি। আভিভাবকেরা যদি শিশুকালেই মানবিক গুণাবলী জাগ্রত করতে তাদের উৎসাহিত ও সচেষ্ট হন তাহলে বয়সকালে তাদের মাঝে পাশবিক গুণাবলী খুব একটা প্রকাশ পায়না ।

যে শিশুটি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ, মানবিক গুনে গুনান্বিত সে শিশুটি হতে পারে পরম সৌভাগ্যবান এবং আনন্দের কারণ।

বংশবৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবেই শিশুকে গ্রহণ করা ঠিক হবেনা। যৌনাঙ্গের অনাকাঙ্খীত ফল-ফসল মাত্রই নয় শিশু।

সন্তানের মাধ্যমেই মানুষ পুনজন্ম লাভ করে।

সন্তান মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

নবী ও আবু উমায়ের (রাঃ)

হযরত আনাসের শিশু ছোট ভাইয়ের নাম ছিল আবু উমায়ের (রাঃ)। তিনি একটি পাখি পালতেন। আবু উমায়েরের পাখিটি ছিল লাল রঙের। তিনি প্রায়ই পাখিটি নিয়ে রাসুলূল্লাহর কাছে আসতেন। তাঁর সাথে দেখা হলেই রাসূল (সাঃ) এই পাখিটির খবর নিতেন। পাখিটির সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় লিপ্ত হতেন। ঘটনাক্রমে একদিন পাখিটি মারা গেলো। আবু উমায়ের খুব শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পাখীর কথা মনে হলেই ক্রন্দন করতেন।

একজন রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রপতি হলে যত আনন্দিত হন, শিশু একটি পাখি বা ছাগল পালন করতে এমন কি ঘুড়ি উড়াতে পারলে তার চেয়ে কম আনন্দিত হয়না। একজন শিল্পপতি তার বিরাট শিল্প সাম্রাজ্যে দেউলিয়া ঘোষিত হলে যত দুঃখ পায়, শিশুর হাতের বলটি গাড়ীর নীচে চাপা পড়লে তার দুঃখ কোন দিক দিয়ে কম নয়।

শিশুর কাছে তার হাতের বেলুন অতি দামী। কোটিপতির কাছে কোটি টাকার গুরুত্ব যতো, শিশুর হাতের বেলুন কম গুরুত্বপুর্ণ নয়। কোটি টাকা হারালে কোটিপতির চোখে পানি নাও আসতে পারে। কিন্তু শিশুর হাতের লাল বেলুনটি ফেটে গেলে তার নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে।

রাসুলূল্লাহ (সাঃ) আবু উমায়েরের পাখি বিচ্ছেদ যাতনা ভুলে যাওয়ার জন্যে বিশেষ কৌশল গ্রহণ করেন। তার মন অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন।

পাখি শব্দের আরবী ভাষার প্রতি শব্দ হলো নুগায়ের। উমায়ের এবং নুগায়ের শব্দের মাঝে ধ্বনি এবং উচ্চারণগত মিল আছে। শোকগ্রস্ত উমায়েরকে দেখে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শেষ শব্দ উমায়ের এবং নুগায়ের দিয়ে কবিতার শ্লোক তৈরী করলেন যার অর্থ হয়– ওহে আবু উমায়ের ! কোথায় গেল তোমার নুগায়ের।" ছন্দগত শ্লোকটি রাসূলের মিষ্ট কণ্ঠে শুনে উমায়ের পাখির দুঃখ ভুলে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে হেসে উঠতো।

কালক্রমে আবু উমায়ের পাখিটির শোক ভুলে গেলেন। রাসুলূল্লাহ (সাঃ) পাখিটির সম্পর্কে তার সঙ্গে কৌতুক করতেন। জিজ্ঞাসা করতেন হে আবু উমায়ের তোমার পাখিটি কোথায় ? আবু উমায়ের হাসতে হাসতে জবাব দিতেন, 'মরে গেছে'।

শিশুর হাসি আনন্দের মাঝে বেহেস্তের কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়।

শিশু কিছু পেতে চায়। যত তুচ্ছই হোক না কেন। কিন্তু কিছুই সে গুদামজাত করবেনা। শিশু এক হাতে নিবে, আর এক হাতে বিলাবে। তার কোন ষ্টোর রুম বা গুদাম ঘর নেই। শিশু স্বার্থপর নয়।

পবিত্র জীবন যাপন করতে হলে শিশুদের শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করা ভালো। জান্নাতী শিশুদের সুহবত, সান্নিধ্যে এবং আচরণের পরিবেশ দোযখের কালিমায় হৃদয় কলঙ্কিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। শিশুদের বেহেস্তী গুণাবলীর কিছুটা প্রভাব অবশ্যই শিক্ষকের উপর পড়বে।

শিশু কালটাই হলো বেহেস্তী জীবন। এ কালে জীবনের দুঃখবোধ থাকে কম।

মাতৃকোল থেকে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও মূল্যবান শান্তির জায়গা ও আনন্দিত আর কিছু নেই। সারাটা দুনিয়ার বদলেও সে মাতৃকোল ছাড়তে চাইবেনা অথচ যে অসহায় শিশু মায়ের বেহেস্তী শান্তির উৎস, সে শিশু শক্ত, সামর্থ এবং বয়োপ্রাপ্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হয় মায়ের জন্য দোযখী যন্ত্রণার কারণ।

উচ্ছন্নে যাওয়া শিশু সাপের বিষ থেকেও মারাত্বক।

একটি শিশুর জন্যে তার ছোট দোলনাটাও একটি বিরাট জায়গা। তাকে এতো বড় জায়গায় না দিয়ে ছোট একটি কোল দিলেই সে অনেক বেশী খুশী ও আনন্দিত হয়।

এ শিশু যখন বড় হয়ে উঠে তার প্রয়োজনও বড় হয়। সারাটি দুনিয়া তাকে দিলেও তা পর্যাপ্ত হবেনা।

যার ছোট একটি শিশু থাকে, সে হতভাগ্য নয়। ক্ষুদ্র শিশুটিই তার সবচেয়ে আনন্দ, গৌরব ও সুখ-শান্তির কারণ হতে পারে।

মানুষ বস্তুপ্রিয়। সম্পদ প্রিয়। দিনরাত ভুতের মতো পরিশ্রম করে। দেশ-বিদেশের পুরানো জিনিষ দিয়ে ঘর সাজায়। পুতুল কিনে ঘর সাজায়। অথচ শিশুরাই হলো সবচেয়ে সুন্দর চলমান জীবন্ত পুতুল।

শিশু সাথে থাকলে মাতা-পিতার কষ্ট অনুভব হয়না। কিন্তু পিতা-মাতার দুর্ভাগ্যের কিছুটা শিশুর উপর পড়লে তাদের কষ্ট বহুগুণ বেড়ে যায়।

শিশুর আহার ও নিরাপত্তা প্রদানের সমস্যা হলে উদ্বেগ বাড়ে। কিন্তু শিশু সাথে থাকলে মনে মৃত্যু, পরকালের বিষয় কম আসে এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকার ইচ্ছে হয়।

শত দুঃখ বঞ্চনা থাকলেও যার সন্তান রয়েছে, সে বঞ্চিত নয়। সন্তানই হলো মানুষের বড় সম্পদ। সন্তান হতে মানুষের জন্যে মহান স্রষ্ঠার মহত্তম অবদান আর কি হতে পারে ?

মহানবী (সাঃ) ও শিশু কান্না

শিশু কান্নার কারণে নামাজ সংক্ষিপ্তকরন

রাসূল (সাঃ) বলেন কখনও কখনও জামাতে সালাত আদায় করার সময় আমার ইচ্ছা হয় আমি কেরাত দীর্ঘ করি। কিন্তু পিছন থেকে কোন শিশুর কান্না শুনতে পেলে আমি নামাজ সংক্ষেপ করে ফেলি। শিশু কান্নায় মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠতে পারে।

শিশুর প্রথম ভাষা হলো কান্না। জন্মের পরই সে কেঁদে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে কথা না শেখা পর্যন্ত শিশুরা কান্নার মাধ্যমে তাদের চাহিদা জানান।

শিশুর পরবর্তী ভাষা হলো হাসি। আদর যত্ন পেয়ে শিশু যখন তার প্রতিক্রিয়া হাসির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারে, তখনই থেকেই মায়ের কোলে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়।

শিশুর নয়ন হলো স্বপ্ন সমুদ্র। এ সমুদ্রের গভীরে কত মনি-মানিক্য লুকিয়ে আছে তা আবিষ্কারে মায়ের জীবন শেষ হয়ে যায়। শিশুর নয়ন সমুদ্র দেখা সমুদ্র দর্শন হতে কম আনন্দ দায়ক নয়।

সুন্দর মন মুগ্ধকর ফুল বাগানে ফুটে থাকে। আমরা পাশ দিয়ে চলে যাই, লক্ষ্য করিনা। ফুল-প্রেমিক এবং বিশেষজ্ঞ সে সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন।

একটি শিশু-বাগে কত প্রতিভার অবস্থান– লক্ষ্য করিনা। শিশুর চোখে থাকে আশা, স্বপ্ন, ভালোবাসা, আনন্দ। এত অর্থবহ দৃষ্টি এবং এতো মধুর দৃশ্য আর কোথায় দেখা যায় ?

অকারণে শিশুর কাঁন্নার অশ্রু ফুলের পাপড়িতে শিশির বিন্দুর থেকেও সুন্দর।

আছাড় খেয়ে বেশী ব্যথা না পেলেও শিশু কাঁদেনা; যদি না কেউ সহানুভূতির দেখার জন্য কাছে থাকে। শিশুর দুষ্টামিতে বিরক্ত মা কাছে আগত শিশুকে দূরে সরিয়ে দিলে শিশু কেঁদে উঠে।

শিশুর মানস এবং আখলাক গঠনে মায়ের হাসি, আদর, গম্ভীর কালো মুখ হতে বড় গ্রন্থ এবং অস্ত্র আর কিছু নেই।

এমন কোন দুঃখ শিশুর নেই, যা তার মা দূর করতে পারেনা। এমন কোন চোখের পানি নেই, যা মা মুছিয়ে দিতে পারেনা। শিশুর মনে এমন কোন আঘাত নেই, যা তার মায়ের চুমু উপশম করতে পারেনা।

শিশুর কানে মায়ের অস্পষ্ট ফিস্ ফিস্ কথা, আশ্বাস বাণী শিশুর উথলে উঠা কান্না থামিয়ে দিতে পারে। খেলতে খেলতে শিশু পা পিছলে পড়ে হাতে, পায়ে, পিঠে ব্যথা পায়। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে দৌড়ে আসে। ব্যথার সব স্থানে মায়ের হাত বুলানো শেষ হওয়ার আগেই ব্যথার উপশম হয়ে যায়। শিশু আবার দৌড়ে খেলায় যোগ দেয়।

মা খেলার স্থানে না থাকলে ব্যথা পেয়ে শিশুর মায়ের কাছে আসে। বাড়ী পৌঁছে, মায়ের কাছে আসার আগ পর্যন্ত তার কান্না থামেনা।

আত্মবিশ্বাস

শিশুর অন্যান্য সমবয়সীদের সমান কাজে ব্যর্থতা বা সমমানের কাজে উদাসীনতা লক্ষ্য করে মনক্ষুন্ন হওয়া উচিত নয়।

যাদেরকে শিশুকালে ইচড়ে পাকা দেখা যায়, পরবর্তীতে তাদের পিছিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। যারা দেরীতে শুরু করে তারা পিছন থেকে এসে এগিয়েও আসতে পারে।

শিশুকালে শারিরীক বৃদ্ধি যেমন সব শিশুর এক গতিতে হয়না, মানসিক বৃদ্ধিও একই গতিতে হয়না। যার মানসিক বৃদ্ধি দেরীতে হচ্ছে, তাই তার জন্যে স্বাভাবিক ধরতে হবে।

কারো বুদ্ধিমত্তা শিয়ালের মতো হতে পারে, কিন্তু কারো সাহস এবং উদারতা হতে পারে সিংহের মতো।

দুঃখ ভারাক্রান্ত বয়স্করা মাথা তুলে তাকাতে পারে। নতুন আশায় বুক বেঁধে সম্মুখে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখী শিশু আশার আলো দেখতে পায়না। সে ভেঙ্গে পড়ে। তার জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

শিশুদের দুঃখ দিতে নেই। শিশুকে স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা এবং দুঃখ ও কষ্ট দেয়া হলো তাকে জীবনমৃত করে রাখা।

শিশু হৃদয়ে ছোট বেলা যে দাগ কাটে তা তিরোহিত হয়না। এর প্রভাব এবং চিহ্ন তার জীবনে চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যদিও ঘটনাটি সে ভুলে যাবে।

যে শিশুকে শিশুবেলা সুখের পরিবেশে রাখা হয় সে অন্যের দুঃখ বুঝতে পারবে। দুঃখী শিশু দুঃখ ততো অনুভব করতে পারবেনা, সুখে প্রতিপালিত শিশু যত অনুভব করবে।

পরের দুঃখ সুখী শিশুর হৃদয়ে যত দাগ কাটবে একটি দুঃখী শিশুর হৃদয়ে ততোটুকু দাগ কাটবেনা। কারণ, সেটা তার মনে হবে স্বাভাবিক এবং মামুলী।

আত্মবিশ্বাস

সরলতা শিশুর সহজাত গুণ। এটা নষ্ট না করে তাতে যোগ করে দিতে হবে আত্মবিশ্বাস। সে পারেনা এমন কাজ তাকে দেয়া ঠিক হবেনা। তাকে বুঝাতে হবে যে চেষ্টা করলে সব কিছু সম্ভব। আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস সৃষ্টি করাতে হবে। এমন দায়িত্ব তার উপর দেয়া উচিত হবেনা যা সম্পন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রকৃতিতে ফুল সবচেয়ে সুন্দর বস্তু। তাই আমরা বলি শিশু ফুলের মতো সুন্দর। এক জাতীয় একটি ফুল অন্য ফুল হতে আকারে বা সুগন্ধে তিন চারগুণের বেশী পার্থক্য হয়না। একটি শিশুর ভবিষ্যত অন্য শিশু হতে হাজার গুণ বেশী সাফল্যময় হতে পারে। কেউ হয়তো সারা জীবনে নিজ সন্তান ছাড়া পাঁচটি শিশুর জীবিকার ভার বহন করতে পারবেনা। কিন্তু একটি শিশু এমন মানুষ হয়ে এমন সংস্থা প্রতিষ্ঠান করতে পারে যাতে হাজার শিশুর ব্যবস্থা হতে পারে।

মহানবী ও শিশু অপরাধী

মৌসুমী ফল

মদীনায় ছিলো বহু খেজুর বাগান। অন্যান্য ফলও বেশ কিছু হতো। সাহাবীদের কারো বাগানে সর্বপ্রথম ফল তোলা হলে অনেকে নতুন ফল রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে নিয়ে আসতেন। শিশুরা মজলিসে উপস্থিত থাকলে তিনি তাদেরকে কাছে ডাকতেন এবং সবচেয়ে ছোট শিশুটির হাতে প্রথমে একটি ফল তুলে দিয়ে ফল খাওয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতেন।

খেজুর গাছে ঢিল

একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি ছোটবেলা আনছারদের খেজুর বাগানে যেতেন। খেজুর পাড়ার জন্য ঢিল ছুড়তেন। একদিন বাগানের মালিক এবং কিছু লোক তাকে দৌড়িয়ে ধরে ফেলে। তারা তাঁকে রাসুলুল্লাহর কাছে নিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঢিল ছুড়েছো কেন' ? আমি বললাম খেজুর খাওয়ার জন্য। সোজা উত্তর শুনে রাসুলুল্লাহ একটু চুপ করে রইলেন। আমাকে কোন বকাবকি বা তিরষ্কার করলেননা। শাস্তি না দিয়ে বললেন "যে ফল নিজে গাছ থেকে তলায় পড়ে, সেগুলো কুড়িয়ে খাবে। ঢিল ছুড়বেনা।" আশ্বাস পাওয়ার পর রাসূল (সাঃ) শিশু-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন।

ছেড়া জামা সেলাই করা যায়। আহত হৃদয়ের ঘা কখনও শুকায়না। শরীরের কাটা ঘা শুকায়। কিন্তু হৃদয়ের ঘা কখনও শুকায়না। গলায় কাঁটা বের করা যায়। কিন্তু মনের কাটা তোলা যায়না।

শিশুরা যাকে না পছন্দ করে, ভাবতে হবে তার মধ্যে শয়তান লুকিয়ে আছে। ফিরিস্তা যেভাবে শয়তানকে চিনে, শিশুরা অনেক ক্ষেত্রে বয়স্কদের থেকে বদলোক বেশী চিনে।

দোষ করলে শিশুকে কিছুটা বকতে হবে। ধমক দিতে হবে। তবে রাগের স্বরে নয়। ভালোবাসার সাথে, আন্তরিকতার সাথে। মায়ের মতো দরদ দিয়ে। বকুনীয় পিছনের অনুভূতি নিজের মন থেকে বের হয়ে যাতে শিশুর মন পর্যন্ত পৌঁছায় – এটুকু নিশ্চিত হতে হবে।

শিশুরা দু'মাস আগে কি হয়েছে ভুলে যায়। দু'মাস পরে তাদের কি করতে হবে বা হতে হবে, তা চিন্তা করেনা। তারা বর্তমান নিয়েই বেঁচে থাকে।

শিশুর ভবিষ্যত চিন্তার দায়িত্ব পিতা-মাতা এবং অভিভাবকের। তাদের সন্তানের বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবেনা। সন্তানের ভবিষ্যত তাদেরকেই চিন্তা করতে হবে।

সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে শিশুকে নিয়মতান্ত্রিক, সুশৃঙ্খল ও সংযমী হতে শিক্ষা দিতে হবে।

শিশুকে ভালোবাসতে হবে। কিন্তু বিবেকহীন ভালোবাসার কারণে শিশুকে প্রয়োজনের সময় শাসন না করে যারা প্রশয় দিয়ে নষ্ট করে, তাদের পাপের ক্ষমা নেই।

যারা নিজ শিশুর ক্ষতি করে তাদের থেকে নিকৃষ্ট মানুষ আর কে হতে পারে ?

ছেলে যদি পুরুষের মত পরিশ্রমী, কষ্ট সহিষ্ণু, উচ্চাকাঙ্খী এবং প্রজ্ঞাশীল না হয়, তার স্বভাব হবে মেয়েলি। কিন্তু মেয়েদের সহজাত গুণাবলীও তার মধ্যে বিকশিত হবেনা।

মেয়েরা নারীর কোমল গুণাবলী নিয়ে বড় হলে দেবীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মেয়েরা পুরুষের পৌরুষে অভিসিক্ত হলে তা হবে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতম।

যে পিতামাতা তাদের সন্তানের সব আশা, কামনা-বাসনা পূর্ণ করেন তাদের সন্তান মানুষ হবেনা, মানুষ নামের পশু হবে। সমাজের জন্যে নিয়ে আসবে দোযখের যন্ত্রনা।

পশুর মাঝেও ভয় ভীতি আছে। আত্মসংযম মনুষ্যত্বের চাবিকাঠি। শিশুর সব আশা পুরণ করলে তার মধ্যে সংযম সৃষ্টি হবেনা।

অতি আদর মানব সন্তানকে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় দোযখের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেয়। অতৃপ্তিহীন সকল তৃপ্তি মানবকে নেশাখোরে রূপান্তরিত করে।

আপনার শিশুকে যদি আপনি তিরস্কার না করেন, দুনিয়ায় সে তিরস্কৃত হতে পারে।

আপনি যদি আঘাত করে স্বীয় শিশুকে সোজা না করেন, সে জীবন পথে অন্যদের থেকে আঘাত পাবে। সোজা হবেনা। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আরো বাঁকা হবে। আপনার আঘাতে আপনার কাছে প্রতিশোধ নিবেনা। নিজের সর্বনাশ করে যতটুকু প্রতিশোধ হয়, ততটুকু ছাড়া।

আপনার শিশুকে আপনি আঘাত দিলেননা, শাসন করলেননা। অন্যের আঘাত খাওয়ার উপযুক্ত হয় – তেমনভাবে কেন গড়ে তুলবেন ? তার চেয়ে নিজে আঘাত দিয়ে আপন সন্তানকে সোজা করে গড়ে তোলা কি সঙ্গত নয় ?

অপরের শাসন অপেক্ষা স্বশাসন, নিজের অন্তরের শাসন অধিকতর কাম্য।

অন্যের ভয়ে বা শাসনে চলা স্বাধীনতাহীনতা। বাইরের বাধ্যবাধকতায় নয়; পিতামাতা, পরিবারে এবং স্বশাসনে জীবন গড়ার মধ্যে রয়েছে তৃপ্তি, আনন্দ, সম্মান ও গৌরব।

গাম্ভীর্য মিশ্রিত নেকী কল্যাণকর। শুধু তারল্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত নয়। মাধূর্যের সাথে থাকতে হবে দৃঢ়তা।

যুদ্ধের ময়দানে শিশু হত্যা

একবার এক যুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণকালে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ঠ হয়ে কয়েকটি শিশু মারা যায়। এ সংবাদে মহানবী (সাঃ) খুবই মর্মাহত হন। জনৈক সাহাবী রাসুলুল্লাহর মনের দুঃখ কমাবার জন্য বললেন – "নিহত শিশুরা ছিল অমুসলিম"। এ উত্তর শুনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ভীষণভাবে রেগে যান। উত্তরে তিনি বলেন, "তারা তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর। সাবধান। কখনও শিশু হত্যা করবে না"। দ্বিতীয়বার বললেন, "সাবধান ! শিশু হত্যা করবেনা"।

শিশু হত্যার জন্য রাসুলুল্লাহর (সাঃ) এই দুঃখ এবং সাবধান বাণী শিশুদের জন্য তার কোমল অনুভূতি প্রতিফলিত হয়।

বেদুইন

একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শিশু নাতি হাসান ইবনে আলীকে (রাঃ) চুমু দিলেন। এ সময় আকরা বিন হারিস তামীমী (রাঃ) তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। শিশুদেরকে রাসুলুল্লাহর আদর স্নেহের দৃশ্যে তিনি আশ্চর্য হলেন।

রাসুলুল্লাকে আকরা তামীমী (রাঃ) বললেন "আমার দশটি সন্তান হয়েছে। আমি কোনদিন তাদের একটিকেও চুমু দেইনি"। রাসুলুল্লাহ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "আল্লাহ যদি আপনার অন্তর থেকে দয়া-মায়া একান্তই তুলে নিয়ে থাকেন, তবে আমার কী করার আছে ? যে ব্যক্তি দয়া করেনা, সে দয়া পায়না"। (হযরত আয়শা এবং জাবির ইবন আবদুল্লা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস (বুখারী ও মুসলিম)।

শিশুর নরম গালে মায়ের চুমু, মায়ের গালে তিন চার বছরের শিশুর চুমুর দৃশ্য হতে মধুর দৃশ্য আর কি হতে পারে !

মহানবী (সাঃ) ও দুই বালক খাদেম

হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং পুত্র উসামা (রাঃ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর প্রিয় পত্নী উম্মুল মুমেনীন বিবি খাদীজার (রাঃ)-এর ক্রীতদাস ছিলেন হযরত জায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)। বিবি খাদীজা (রাঃ) রাসূলের সাথে তাঁর শাদী মুবারকের পর যায়েদকে (রাঃ) রাসুলুল্লাহর সেবায় নিয়োগ করেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে আজাদ করে দেন।

বালক যায়েদ-বিন হারিছা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে এতবেশী আদর স্নেহ পেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর বাবা-মার কাছে পর্যন্ত ফিরে যেতে চাননি। তাঁর পিতা-পিতৃবা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে নিজেরাই ফিরে যান।

মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যায়েদ বিন হারিছার (রাঃ) পুত্র ছিল উসামা (রাঃ)। শিশু উসামাকে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত ভালবাসতেন। অনেকে বলতো রাসূল (সাঃ) উসামাকে হুসাইনের (রাঃ) ন্যায় ভালবাসেন। তিনি নিজ হাতে তার নাক পরিষ্কার করে দিতেন। রাসূল (সাঃ) ঠাট্টা করে বলতেন উসামা যদি মেয়ে হতো আমি তাকে অলংকার পরাতাম।

মক্কা বিজয়ের পর নগরীতে প্রবেশের সময় রাসূলের সঙ্গে উঠের পিঠে ছিলেন দু'জন। একজন তার জৈষ্ঠ্যা কন্যা জয়নবের (রাঃ) শিশুপুত্র আলী এবং দ্বিতীয় জন ছিল কিশোর উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)।

নবীদের কাছে ফিরিস্তা আসেন শান্তি ও ভালোবাসার বাণী নিয়ে। বয়স্করা এ বাণী বিশ্বাস নাও করতে পারেন।

শিশু কোনো বাণী নয়, বাস্তব। ক্ষুদে শিশু মুর্তিমান ভালোবাসা। শিশু ফিরিস্তাতুল্য। প্রয়োজনের জন্যে ফিরিস্তারূপী শিশু মানুষের উপর নির্ভরশীল।

বড় নক্ষত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহগুলো মাধ্যাকর্ষন উপেক্ষা করে বেশী দূরে যেতে পারেনা। গ্রহ যত ক্ষুদ্র হবে, নক্ষত্রের তত কাছে থাকবে। শিশু যত ছোট থাকে, স্রষ্টার ততো কাছে হতে পারে হাশরে তার অবস্থান।

বালক হযরত আনাসের খিদমত

হযরত আনাসের মা উম্মু সুলাইম বিন মালহান অতি আগ্রহে তাকে শিশু বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে নিয়োগের জন্যে পেশ করেন। মহানবী (সাঃ) তাকে কবুল করে নেন।

তিনি ছিলেন একজন কুরাইশ মহিলা, আমীর ইবনে গানাস কুরাইশী ছিলেন উম্মু সুলাইম এবং রাসূলের দাদা আবদুল মুত্তালিবের মায়ের দিক থেকে পূর্ব পুরুষ।

হযরত আনাস দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর খেদমতে ছিলেন। বালক আনাসের সাথে বৃদ্ধ নবীর মধুর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। হযরত আনাসের পিতার নাম ছিল মালিক বিন নজর বিন দামদাম ইবন যায়েদ নাজ্জারী খাযরাজী।

কোন এক সফরে হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) গোসলের জন্য পানি আনলেন। পানি একটু উঁচু জায়গার পাদদেশে রেখে রাসুলূল্লাহকে গোসলের জন্য ডাকলেন। রাসুলূল্লাহ (সাঃ) গোসল করতে গিয়ে হযরত আনাসের হাতে একটি চাদর দিলেন এবং বললেন চাদরটি দু'হাতে মেলে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াও। আমার গোসলের জন্য পর্দা কর।

রাসূল (সাঃ) গোসল সমাধা করলেন। এরপর রাসূল (সাঃ) পানি আনলেন এবং একই স্থানে রাখলেন। তারপর হযরত আনাসকে ডাকলেন। হযরত আনাস আসার পর তিনি তাঁর দু'হাত প্রসারিত করে তাঁর চাদরটি দিয়ে বালক আনাসের জন্য পর্দা করলেন এবং তাকে গোসল করতে বললেন। বালক আনাসও (রাঃ) তাই করলেন।

কোন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে ভালো কাজ করানো যায়, কিন্তু বাধ্য করে ভালো কাজ করানো হলে তা একবারই সম্ভব বা যতদিন পর্যন্ত বাধ্য করে করান যায় ততদিনই তিনি করবেন। আর যখন করতে বাধ্য হবেননা তখন ছেড়ে দেবেন।

যদি ভালো কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয় এবং খারাপ কাজ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় করা যায়, তবে মানুষ খারাপ কাজই পছন্দ করবে। স্বাধীনতা অতি প্রিয় এবং আনন্দদায়ক জিনিস।

যে কাজ করে মানুষ আনন্দ পায়, সন্তুষ্ট হয় সে কাজই করে। অন্যভাবে নয়। সন্তুষ্ট চিত্তে যে কাজই করা হয় না কেন, সে কাজই স্থায়ী হয়।

শিশুদেরকে কোন ভালো অভ্যাস করাতে হলে ভীতির মাধ্যমে নয়, আনন্দের মাধ্যমে, প্রস্তাবের মাধ্যমে, উৎসাহ দিয়ে আনন্দ দিয়ে এবং উদ্বুদ্ধ করিয়ে করাতে হবে। তবেই তা স্থায়ী হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে কোন একটি কাজে যেতে বললেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন "আমি যাবনা। আমি কখনও যেতে পারবনা।" রাসূল (সাঃ) জানতেন যে, হযরত আনাস অবশ্যই যাবেন। হযরত আনাস (রাঃ)ও বলেছেন "আমার মনে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে যে কাজে আদেশ করেছিলেন তা আমি অবশ্যই করব।'

হযরত আনাস (রাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে পথে একটু এসেই দেখলেন, ছেলেরা খেলছে। তিনিও তাদের সাথে খেলতে শুরু করে দিলেন। খেলার মাঝে পড়ে তিনি কি জন্য এসেছিলেন তা ভুলে গেলেন।

কিছু সময় পর তিনি অনুভব করলেন পিছন থেকে কে যেন এসে তার ঘাড় ধরেছেন। পিছন ফিরে দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়িয়ে হাসেছেন। স্নেহ সিক্ত কণ্ঠে মনে করিয়ে দিলেন "তোমাকে যে কাজটি করতে বলেছি তা করে এসো।" ভাবটা এই– তুমি কেন এখানে খেলতে লেগে গেছ তা আমি ধরে ফেলেছি। তুমি তো আমার নির্দেশ ভুলেই গেছো।

হযরত আনাস জানালেন "ইয়া রাসূল্লাহ, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি"। যদিও কাজটি ছিল জরুরী, রাসূল (সাঃ) বিন্দু মাত্র বিরক্ত হলেননা। বালক আনাস যে সমবয়সীদের খেলা করতে দেখে নিজের কাজের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তা রাসূল (সাঃ) ঠিকই বুঝেছিলেন।

বালক আনাস মাঝে মাঝে যা করতেন জবাব দিতেন তার উল্টোটা। রাসূল (সাঃ)ও তাকে মাঝে মাঝে বকতেন। একটি বকুনি ছিল নাম না ধরে অন্য নামে ডাকা। তিনি তাকে ডাকতেন "ওহে দু'কানওয়ালা" বলে। দু'কানওয়ালা শব্দটি কোন গালি ছিলনা। এটা ছিল আদরের বকুনি। সব মানুষেরই তো দুই কান থাকে। এক কানওয়ালা বললে না হয় বিরক্তি বা বকুনি বুঝা যেতো।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দশ বছরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ কখনও তাকে কোন ব্যাপারে একটুও ধমক দেননি। কখনও 'তুমি কেন এটা করেছ' অথবা 'কেন এটা করলেনা' বলে কৈফিয়ত তলব করেননি। (বুখারী)

একটি বালকের কিয়তকাল আনন্দে যে আনন্দিত হয়না, সে প্রিয় নবীর প্রিয়ভাজন হতে পারেনা। কোলের উপর ঘুমন্ত শিশুকে চুমু দিয়ে বিছানায় শোয়াতে কোন মায়ের মন আনন্দে ভরে উঠেনা ?

কাউকে দোষ দেখিয়ে তাকে লজ্জিত করে সঠিক পথে আনা কষ্টকর।

ভীতি ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুকে কোন কাজ করতে বাধ্য করার চেয়ে স্নেহ ও ভালোবাসা, উৎসাহ ও প্রশংসা দিয়ে কোন কাজ করানো অনেক ভালো এবং তা সহজতর।

শিশুরা অলস নয়। যতক্ষণ শরীরে শক্তি থাকে এবং অসুস্থ না হয়, তারা জেগে থেকে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবেনা। তাদের এনার্জি সীমাহীন। তাদের অপরিমেয় কর্মশক্তি তাদের কল্যাণের দিকে চালিয়ে নিতে হবে।

মানুষের প্রতি, বিশেষ করে শিশুর প্রতি প্রথম দায়িত্ব হলো তাদের সুখী করা। অনেকে শিশুদের উপকার করতে চায়। মনে করে উপকার করলেই তারা সুখী হবে। তা নয়। সচেতন

ভাবে তাদের সুখী করার চেষ্টা করতে হবে।

মুখে কড়া কথা বললাম, কিন্তু তাদেরকে সম্পদ অর্জনে সাহায্য করলাম। এতে সম্পদ পেয়েও মানুষ সুখী হয়না। ধন ও ঐশ্বর্য্য হতে ব্যবহার মানুষের কাছে অনেক বেশী দামী।

কারো ভালো করার জন্যে রুঢ় ব্যবহার কাজে আসেনা।

উপদেশ কেউ না চাইলে দিতে নেই। অযাচিত উপদেশে কোন কল্যাণ হয়না। নিজের সন্তানকেও অযাচিত উপদেশ দিলে তেমন কল্যাণ হয়না।

শিশু হৃদয় নরম মোমের মতো। মোমের উপর সিল মোহর দিলে দাগ যত স্থায়ী হয়, শিশু মনে উপদেশ এবং শিক্ষার প্রভাব ততো সুন্দর এবং স্থায়ী হতে পারে।

উপদেশ উপকারী, পরিবেশনা ঠিক না হলে তা হতে পারে সবচেয়ে অপকারী। অনেক সন্তান অন্য যে কোন মানুষের কথা শুনবে, কিন্তু স্বীয় পিতার কথা শুনবেনা। কারণ শিশুকালে পরিবেশনা ঠিক না হওয়ায় বদ হজম হয়ে গেছে।

জ্ঞানী এবং গুণীদের সন্তান তাদের মতো হয়না। কারণ তারা বেশী দিতে চান, যা গ্রহণ করার শক্তি শিশুর থাকেনা। উপদেশের বোঝায় তাদের নৈতিকতার মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। জ্ঞানী লোকের সন্তান বখাটে হওয়ার কারণও তাই।

আয়নার সামনে যে ছবি রাখা হয় তার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠে। শিশুর কচি হৃদয়-মন আয়নার মতো। সে আয়নার যে ছবি স্থাপন করা হয় বয়স্ক হলে তাই তার সফলতা, কর্মে এবং চরিত্রে প্রতিফলিত হয়।

রাসূলুল্লাহ-এর সঙ্গে হযরত আনাস (রাঃ) এবং যায়েদ (রাঃ) এর সম্পর্ক চাকর মনিবের সম্পর্ক ছিলনা। এ সম্পর্ক ছিল শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী ছাত্রের সম্পর্ক। বাসার কাজের ছেলে এবং গৃহকর্তার সম্পর্ক তাদের মধ্যে ছিলনা।

বয়স্কদের প্রতি দুর্ব্যবহার অমানবিক। কিন্তু শিশুর প্রতি দুর্ব্যবহার পশুসম।

প্রত্যেক মানুষই শিশু কামনা করে। কিন্তু শিশুকে মানুষ করার সাধনায় প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেনা।

মায়ের শিক্ষারই আসল প্রভাব পড়ে শিশুর কচি ও কোমল হৃদয়ে। দরদহীন শিক্ষকের প্রভাব মস্তিকে। ভালোবাসা সিক্ত না হলে শিক্ষার প্রভাব হৃদয়ে পড়েনা।

যেভাবে মা-বাবা শিশুকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং সফল পরিকল্পনা করতে পারেন, শিশু সেভাবে গড়ে উঠে। একবার খাঁজ ঠিক হয়ে গেলে অন্যভাবে গড়ে উঠতে পারেনা।

আমাদের বাসায় যে কাজের ছেলেরা চাকুরী করে তাদেরকে আমরা অফিসে পিয়ন, চাপরাসী, এম,এল,এস,এস এবং কারখানার দারোয়ান শ্রমিকের কাজ দিয়ে দিতে চেষ্টা করি। এতে চাকর ছেলে এবং তার পিতামাতা সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকেন। তারা কখনো জীবন সংগ্রামে আমাদের নিজস্ব সন্তানের মত পেশাগত সাফল্য অর্জন করতে পারেনা।

রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর কাজের ছেলে ছিলেন দু'জন। একজন হযরত যায়েদ (রাঃ) অপরজন হযরত আনাস (রাঃ)। তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক, আধ্যাত্মিক, মানবিক মর্যাদায় কত উপরে উঠেছিলেন ?

মুতার যুদ্ধে হযরত জায়েদ (রাঃ) ছিলেন সেনাপতি এবং প্রথম কাতারের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ সাহাবীগণ ছিলেন সৈনিক। হযরত আনাস (রাঃ) ছিলেন হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম।

শুধু তখনকার দিনে মহানবীর জীবিত থাকাকালে রাসূলের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই নয়, আজও তাঁদের মর্যাদা মুসলিম বিশ্বেও বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। দেশের রাষ্ট্র প্রধান সরকার প্রধানদের মর্যাদা স্বাভাবিক কারণেই অন্যদের থেকে বেশী হয়।

সম্মুখে পড়লে ভদ্রতা এবং সামাজিক কারণে রাজা বাদশা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে ইজ্জত দেখাতে হয়। কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে আমাদের সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা কি অলি-আউলিয়া, গাউস কুতুব, সূফী দরবেশদের জন্যে বেশী নয় ? সাহাবীদের অবস্থান তো আরো অনেক উপরে।

উদাহরণের খাতিরে ধরা যাক হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) এর পাগড়ী কোথাও আবিষ্কৃত হলো এবং তা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। এগুলোর দ্বীনী বা আধ্যাত্মিক মূল্য কানাকড়িও নেই। তবুও সাহাবীদের স্মৃতিধন্য তাঁদের ব্যবহার্য দ্রব্যের ইজ্জত কতটুকু হবে ?

মুসলিম মন-মানসে কি জীবন্ত রাজা বাদশা, সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের অপেক্ষা সাহাবীদের ব্যবহার্য্য ১৪০০ বছরের পুরানো পাগড়ীর মর্যাদা বা ইজ্জত বেশী হবেনা ? শুধু পাগড়ী নয়; এমনকি হযরত আনাস বা হযরত যায়েদের একখানা জুতার ইজ্জত যে কোনো জীবিত মুসলিমের ইজ্জত অপেক্ষা অনেক বেশী হবে, যত বড়ই তাদের বর্তমান জাগতিক অবস্থান হোকনা কেন। সোহবত, নৈকট্য রাসুলুল্লাহ এর সাহাবীদেরকে এমন অনন্য মর্যাদার অধিকারী করেছিলেন যা অতুলনীয়, অকল্পনীয় এবং অমুসলিমদের নিকট অবিশ্বাস্য।

শিশুর নৈতিক শিক্ষা

মা-বাবাকে শিশুর শিক্ষা এবং জীবনাচরণ এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে তারা হাশরের মাঠে প্রিয় নবীর হাতের দেয়া হাউজে কাওসরের পানি পান করার যোগ্য হয়ে মৃত্যু বরণ করে। পেয়ারা নবীর কাছে মা বাবার অবদানের সাক্ষ্য দিতে পারে। বলতে পারে ইয়া রাসুলুল্লাহ। আমার মা বাবার শিক্ষা এবং যত্নের ফলে আজ আপনার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আপনার মুবারক হাতের দেয়া পানি আমার মা বাবাকে ছেড়ে আমি কি করে পান করতে পারি ?

সন্তান দ্বীনি আমল করে পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করার মানসিকতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে না উঠলে পিতা-মাতার জন্যে শুধু এ দুনিয়ায়ই সমস্যা হয়ে দেখা দেয়না, বরং আখিরাতে তাদের জন্যে বাবা মাকে অনেক বেশী শাস্তি পেতে হবে। কারণ, সন্তানেরা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে যে ঈমানদার হওয়ার জন্যে আমাদের বাবা-মা আমাদেরকে শাসন করেনি। সোহাগ দিয়ে বিপথে যেতে সাহায্য করেছে।

আপনার সন্তানকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করুন। তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় রশি ঢিলা করে ছেড়ে দিন। যতদূরে ইচ্ছা গমণ করুক।

জন্মের পর থেকে রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহ সমুদ্রে অবগাহন করতে দিন। সকল কাজে এবং কর্মে আপনার সন্তান যেন সুন্নাহ অনুসারী হয়।

আল্লাহ মানুষকে যা দিয়েছেন কোন পিতাই সন্তানকে তার অনু পরিমাণ দিতে পারেনা। তবুও মানুষ সন্তানকে যা দিতে চায় আল্লাহকে তার অনুপরিমাণও দিতে চায়না।

ব্যাঘ্র গোস্ত খেতে খেতে এমনভাবে গোস্তে আসক্তি হয়ে পড়ে যে সে গোস্ত ছাড়া আর কিছুই খেতে চায়না। অন্যকে হত্যা করেও তার চাহিদা পূরণ করে নেয়। যে শিশু দুঃখে অভ্যস্ত নয়, সে নিজের চাহিদা আদায় করে নিতে পারে অন্যকে দুঃখ দিয়েও।

শিশু বেহেস্তী দূততুল্য। যারা খারাপ কথা বলতে এবং শুনতে অভ্যস্ত, তারাও কথা বলার সময় সতর্ক হয় যদি কোন শিশু কাছে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তি এমন কথা বলবেনা যা শিশুর শুনা উচিত নয়।

কোন শিশুকে যত কিছু সে চায় বা আশা করে, সব দেয়া উচিত নয়। ছোটবেলা হতে তার মাঝে অতৃপ্তির প্রতি সহনশীলতা সৃষ্টি করতে হবে। সংযম উন্নয়ন করতে হবে।

দোষ করে অশ্রু স্বজল নেত্রে ক্রন্দন করে– এরূপ শিশুর হৃদয় গঠনের মাঝেই পিতা মাতার সাফল্য হয়েছে। যে শিশু দোষ করে স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কাঁদে, সে বড় হয়ে নিজের শাসক হতে পারবে। সংযমী হবে। জীবন সংগ্রামে সফল হবে। ঈমানদার হলে বেহেস্তি হবে।

অনন্তকালের তুলনায় মানবজীবন একটি মুহুর্তও নয়। মহান স্রষ্টার কাছে একজন মানুষের সারাটি জীবন একটি মূল্যহীন অনুও নয়। শিশুর সব দোষ মা যেভাবে ক্ষমা করে দেন, আমাদের সব পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন – এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

শিশু প্রকৃতি

শিশুরা শুধু দেখেনা, তারা ভাবে, কল্পনা করে। তাদের কল্পনার গতি বল্গাহীন। তাদের কল্পনায় অসম্ভবও সম্ভব বলে প্রতিভাত হয়। পঙ্খীরাজ ঘোড়া একটি শিশুকে পিঠে নিয়ে তারকা জগত পার হয়ে যাচ্ছে এরূপ কল্পনা করতে তাদের কোন কষ্টই হয়না। অসম্ভব মনে হয়না।

পূর্ণ বয়স্ক, অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শিশুর অন্যদের অভিজ্ঞতার তেমন প্রয়োজন নেই। কারণ, শিশু বিশ্লেষণ করতে পারেনা। সে যতটুকু কাছে থেকে দেখে, ততটুকুর বেশী বুঝতে পারেনা।

মনের খবর

না জানা, খবর না রাখা শিশুর জন্যে লজ্জাজনক করে তুলতে হবে। ঘরের কোথায় কি সুন্দর জিনিষ আছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তাদের জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে হবে।

ঘ্রাণ

ঘরের কোথায় কি আছে কুকুর গন্ধ শুকে তা বুঝতে পারে। শিশুদের ঘ্রাণ শক্তিও প্রখর। ঘরের কোথায় কি রাখা আছে বাবা মা ভুলে গেলেও শিশুরা একবার দেখে মনে রাখতে পারে।

শিশুদের শুধু ঘ্রাণশক্তি নয়, দর্শনশক্তি প্রবল। তাদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। কিছুই তাদের নজর এড়ায়না। তারা অনেক কিছু বুঝেনা। কিন্তু দেখে এবং বয়স্কদের ব্যাপারে উৎসুক হয়।

মা বাবা যখন অতিথিদের সাথে কথা বলেন, তখন কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন শিশুরা অনুভব করতে পারে। তাদের সম্বন্ধে পরে যে সমস্ত আলোচনা বাবা-মা এর মাঝে হয় তা হতে শিশুরা বুঝতে পারে কার সাথে সম্পর্ক কত গভীর এবং ভালবাসা কতটুকু।

সম্পর্কে মৌখিক এবং আন্তরিক দু'ধরণের মাপকাটি শিশুরা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। তারা অতিথিদের সাথে সে ধরণের ব্যবহারই করে যেমন তাদের প্রতি তাদের বাবা-মা করে থাকে।

খালা ফুফু

বাবা মার সম্পর্ক যাদের সাথে আন্তরিক, কথাবার্তায় আন্তরিকতার বাড়াবাড়ি না হলেও সে সমস্ত বাসায় যেতে এবং তারা কিছু এনে হাতে দিলে তারা গ্রহণ করতে আপত্তি করবেনা। খালা, ফুফুর বাসায় যেতে মায়ের অনুমতির অপেক্ষা করেনা। আগেই কোলে উঠে বসে থাকে বা তাদের গাড়ীতে আগে গিয়ে উঠে।

শিশুরা লক্ষ্য করে খালা বা ফুফুর বাড়ীতে জিনিসপত্র ভেঙ্গে ফেললে খালা-ফুফুর ভ্র-কুঁচকে যায়না, নিঃশব্দে কপালেও ভাজ পড়েনা। বরং শো-কেসের জিনিস হাতাহাতি করতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেললে খালা-ফুফুর কোলে বন্দীখানার জায়গাটা অতি সহজে পাওয়া যায়।

দামী জিনিষটা কে ভেঙ্গেছে জিজ্ঞাসা করলেও ভয়ে ভয়ে নয়, নিঃশঙ্কচিত্তে মাথা নেড়েই জবাব দেয় সেই ভেঙ্গেছে। আর জানে দোষটাও মাফ হয়ে গেছে।

ও ঠিকই বুঝতে পারে নিজের ঘরে শো-কেইসের জিনিষ ভেঙ্গে মায়ের কাছে থেকে যতটুকু শাস্তি পাওয়া যেতো, খালার কাছ থেকে ততটুকুও পাওয়া যাবেনা।

শিশুর মন মানসিকতা ও প্রবণতা নদীর সাথে তুলনীয়। খাল কেটে নদীর পানি বহু দূরে নেয়া যায়। খাল ক্রমশঃ গভীর করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নদীতে এনে ফেলা যায়।

নদীর পানি খাল কেটে এঁকে-বেঁকে যত দিকে ইচ্ছা নেয়া যায়, এক জায়গায় ঘুরান যায়। বিপরীত মুখেও প্রবাহিত করা যায়। শিশুর মন মানসিকতা, প্রবণতাও অনুরূপ। ভালোর দিকে নেয়া যায়। মন্দের দিকে টানা যায়। ভালোমন্দ উভয় দিকে প্রবাহিত এবং প্রসারিত করা যায়।

শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব কর্তৃক এবং পরিবেশের কারণে শিশুর মেধা ও প্রবণতা বিভিন্ন দিকে প্রভাবিত ও প্রবাহিত করা সম্ভব।

শিশু শিক্ষা

শিশুর আচরণ দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়ে। জানতে ইচ্ছে হয় এ শিশু কোন মায়ের সন্তান ? কোন পরিবারের সন্তান ? স্নেহময়ী মায়ের নিঃশব্দ গম্ভীর কালোমুখ শিশুর কাছে শিক্ষকের বেতের আঘাত থেকেও অনেক বেশী ভীতিপ্রদ।

শিশু হলো কাঁচা সোনা। তাকে দামী অলঙ্কারে উন্নীত করতে হবে। সোনা কাঁচা থাকতেই তাতে মূল্যবান অলঙ্কারে রূপান্তরিত করতে হবে। অলঙ্কার পছন্দ না হলে তা ভেঙ্গে নতুন করে গড়া যায়।

মাতা-পিতার পছন্দহীন মন-মানসিকতা নিয়ে শিশু গড়ে উঠলে তাকে ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করা যাবেনা। পিটিয়েও সোজা করা যাবেনা।

শিশুর মন যখন কোমল ও নরম থাকে, তখনই তা গভীর মনোযোগ দিয়ে সোজা করে নিতে হয়। মাতা-পিতাকে প্রতিটি মুহূর্তে তাদের শিশুটি স্মরণে থাকা উচিত। মন নরম থাকাকালে সকল গুণাবলীর অঙ্কুর তার মনে বপন করতে হবে।

ছেলেকে যদি ছেলের মত গড়ে তোলা না হয়, যদি তাকে কষ্ট করতে না শিখান হয়, সে মেয়েলী স্বভাবের ন্যায় গড়ে উঠবে। তার মধ্যে মেয়েদের সকল দুর্বলতা প্রস্ফুটিত হবে। কিন্তু মেয়েদের কোন গুণাবলী দেখা যাবেনা।

খেলা

খেলনা, ঠোঙ্গা নিয়ে খেলা হতে কেরাম খেলার দিকে টেনে নিতে হবে। টেনিস রেকেট, ব্যাডমেন্টন রেকেট, ফুটবল, ক্রিকেট বল ইত্যাদি দেয়া হলে সেগুলির দিকে মন যাবে। হাড়ি পাতিল নিয়ে খেলতে আর মন চাইবেনা।

নির্দেশ মানা

শিশুর প্রথম শিক্ষা হবে নির্দেশ মান্য করার শিক্ষা।

ভাইকে কমলা দাও। আপাকে চকলেট দাও। যদি না দিতে চায় তবে আরো একটা বড় হাতে রেখে বলতে হবে, কমলা ওটা ভাইয়াকে দাও, তা হলে এটা তোমাকে দেব। ভাইয়াকে দিয়ে আস– তারপর এ কমলা নিয়ে যাও।

খেলনা নিয়ে যাও। আমাকে বই দাও। আমি খেলনা দিব।

আব্বাকে বিসকিট দাও। টুপি দাও। আমি কমলা দেব। দাদাকে চুমো দাও। তোমাকে আপেল দেব। কোন কিছু দেবার আগেই একটি হুকুম মান্য করাতে হবে।

শিশুরা ক্লান্ত হয়না। তাদেরকে হুকুম মানাতে অভ্যস্থ করতে হবে।

শিশুকে কোন কিছু গিয়ে দিতে নেই, ডেকে দিতে হবে। ফলে জিনিসটিও দেয়া হলো, সাথে সাথে একটি হুকুম মানার অভ্যস্থ করা হলো।

শিশু অনেক কিছু চায়। কোন কিছু চাইলেই তার কাছে কিছু চাইতে হবে। একটা হুকুম মানাতে হবে।

আম্মা! বিস্কুট দাও। শুনে আম্মা বলবেন তুমি অনেক কিছু ধরেছ। ময়লা লেগেছে। ময়লা থাকলে দেখাতে হবে। বলতে হবে বাথরুমে হাত ধুয়ে আস।

যদি না যেতে চায়, সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। নিজে আগে হাত ধুতে হবে। তাকে হাত ধোয়ার জন্যে, কুলি করার জন্যে, দাঁত মাজার জন্যে বলতে হবে। তারপর তার প্রার্থীত বস্তুটি দিতে হবে।

সেনা বাহিনীতে left, right, attention, stand at ease এতো বেশী করা হয় যে attention শব্দ শুনলে পা দু'টি একত্র হয়ে যায়। বাড়ীতেও শিশুকে তেমন ভাবে হুকুম পালনে অভ্যস্থ করে নিতে হবে।

শিশুরা বয়স্কদের কোল ভালোবাসে। কোলে উঠতে চাইলেই বলতে হবে, তোমার গাড়ীটি নিয়ে এসো, বলটি নিয়ে এসো। শিশুরা তাদের জিনিষ দেখাতে এবং তা নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসে। মূলকথা হলো – শিশুকে আদেশ পালনে অভ্যস্থ করতে হবে। মা-বাবা বা বড়দের কথা শুনা অর্থাৎ মানা যেন তার স্বভাবে পরিণত হয়।

আমরা শিশুকে শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু তাদের থেকে কোন শিক্ষা নিতে চাইনা। দুনিয়াটা হলো দেয়া নেয়ার জায়গা। শিশু হতে কিছু নেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে শিশুকে অনেক কিছু দিতে পারবো।

শিশুকালের অভ্যাস এবং স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী স্থায়ী হয়। ছোট বেলার অভ্যাস অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয়না শিশু স্মৃতিও অনেক ক্ষেত্রে মুছে ফেলা যায়না।

শিশু প্রশিক্ষণ

আদর্শ শিশু বলে কিছু নেই। পরিবেশ এমন করতে হবে যে শিশু যেন স্বাভাবিক ভাবেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুন্দর স্বভাব নিয়ে গড়ে উঠে। শিশু যদি বুঝতে পারে তাকে বিশেষ ধারায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেদিকে যাবেনা।

ইতিবাচক মন

আল্লাহ শিশুদের ইতিবাচক মন দিয়েছেন। তুমি কি বিষ খাবে ? জিজ্ঞাসা করলে শিশু বলবে– খাবো। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি কাল মরবে। সে বলবে – মরবো। তুমি কি আজ বিয়ে করবে, সে বলবে – করবো।

তাজমহল, কুতুব মিনার, আগ্রা দুর্গ ইত্যাদি দেখিয়ে কে কোন্‌টি তৈরী করেছে তা জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং সেও সেরূপ তৈরী করবে কিনা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

বড়লোক আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে নিয়ে সেও এমন বাড়ী তৈরী করবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে হবে। কর্মকর্তার শান শওকত সম্মান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে সেও সেরূপ বড় সাহেব হবে কিনা।

কোন শিশুর ভবিষ্যত অন্ধকার নয়, যদি তার আকাঙ্খা এবং মনের ক্ষুধা সৃষ্টি করা যায়। একটি বড় বাড়ী দেখলে বলতে হবে – তুমি কি এমন বাড়ী করবে ? পুল দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করতে হবে– তুমি কি অমন বড় পুল বানাতে পারবে ?

শিশু অনুকরণ প্রিয়। তার প্রয়োজন অনুপম আদর্শ।

বড় জিনিষ, ভালো কাজ, গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলে প্রশংসা করে বড় কাজ, ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। ক্ষুদ্র অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে দেখলে নিরুৎসাহিত করতে হবে। উপেক্ষা করে ঐ সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র কাজ হতে দূরে সরিয়ে নিতে হবে।

ব্যর্থতা, আত্মবিশ্বাস

তবে শিশুদেরকে এমন কাজে উৎসাহিত করা ঠিক হবেনা– যে কাজ তারা করতে পারে না। ব্যর্থতার ফলে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়– এমন কাজে তাদেরকে উৎসাহিত করা ঠিক হবেনা।

অল্প বয়সে লজ্জিত হওয়ার অভ্যাস রাখতে হবে। তবে আদর করে দিয়ে মনোবল ফিরিয়ে আনতে হবে।

শিক্ষার সাথে সাথে শিশুকে শাসন করতে হবে। তারই অন্যকে শাসন করার অধিকার আছে যে নিজেকে শাসন করতে পারে।

সমালোচনা শিশুর বোধের অতীত। সমালোচকের কোন প্রয়োজন শিশুর নেই।

শিশুকে প্রশংসা করতে হয়। প্রশংসা ছাড়া শিশুর মনের উপর অন্য কোন প্রভাব ততো কার্যকরী নয়।

শিশুকে ভালো কাজ করে আনন্দ পেতে প্রশিক্ষিত করতে হবে। ভালো কাজ করলে আনন্দিত হলে এবং তাদেরকে বাহ্‌বা দিলে তারা আরো ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হবে।

শিশুর প্রশংসা কতটুকু করবো ? ততটুকু নয়, যতটুকু গুণাবলী শক্তি সামর্থ আমি তার মাঝে দেখতে পাই। বরং ততটুকু প্রশংসা করতে হবে যতটুকু আমি তার মাঝে ভবিষ্যতে আশা করি। তা হলে তা অর্জনের আগ্রহ তার মধ্যে সৃষ্টি হবে।

পড়ার পরিবেশ

যে বাড়ীতে শিশুরা বেশী বই নাড়াচাড়া করে সেখানে নিতে হবে। যে বাড়ীতে শিশুরা সকালবেলা পড়ে সে বাড়ীতে নিয়ে বলতে হবে– ওরা পড়ছে, এখন কথা বলছেনা, চলো চলো আমরা বাড়ী গিয়ে পড়বো। এসেই মুখস্ত করালে হবেনা। ছবি দেখিয়ে, তাকে পড়ার বই নিয়ে বসিয়ে রাখতে হবে।

এ পদ্ধতিতেও যদি কাজ না হয়, যে বাড়ীতে শিশুরা লেখাপড়া করে সে বাড়ীতে শিশুকে নিয়ে তাকে বইয়ের সান্নিধ্যে বসিয়ে রাখতে হবে।

ঐ বাড়ীর কাউকে আগেই বলে রাখতে হবে যে– এ শিশু অন্য কিছু করতে চাইলে বিরক্তির স্বরে বলতে হবে– এটা অন্য কিছু করার সময় নয়। পড়ার সময়।

স্কুলে নিয়ে বসে বসে বই দেখাতে হবে এবং দেখাতে হবে অন্য সকলে বই পড়ে। জিজ্ঞাসা করতে হবে তুমি এখন কি করবে। দেখা যাবে সেও বই পড়তে চাইবে।

কোন বিরাট লাইব্রেরীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে তুমি কি সবগুলো বই পড়বে ? তুমি সবগুলো বই এর ছবি দেখবে ? সে বলবে দেখবো। তখনই ছবিওয়ালা শিশু দর্শনীয় বই নিয়ে একটির পর একটি ছবি দেখিয়ে কয়েকটি বই দেখিয়ে নিতে হবে। বলতে হবে আরেক দিন বাকীগুলো এসে দেখবো।

শিশুদের ছবি দেখিয়ে তার নিজের মনের কল্পনা এবং ছবির সাথে মিলাতে হবে। ছবি দেখতে দেখতে বই এর ভিতর কি গল্প আছে তা জানতে চাইবে।

বড় বড় বই দেখিয়ে জিজ্ঞসা করতে হবে – সে এর চেয়ে বড় বই লিখবে কিনা। সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ভবিষ্যতের দৃষ্টি তার চোখের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

নবী পরিবারে শিশু-মৃত্যু

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শিশুরা ফুলের মত সুন্দর ও কোমল। তারা আল্লাহর বাগানের ফুল। রাসুলুল্লাহর তিনটি পুত্র ছিল। তাদের নাম কাসেম (রাঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং ইব্রাহীম (সাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহর দু'টি উপনাম ছিল– তাহের এবং তৈয়ব। মহানবীর কন্যাদের নাম যথাক্রমে জয়নব (রাঃ) রুকাইয়্যা, (রাঃ) উম্মে কুলসুম (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ বিবাহের পঞ্চম বছরে তাঁর জেষ্ঠ্য কন্যা জয়নবের জন্ম হয়।

ফুলের মতো নিষ্পাপ মহানবীর শিশু পুত্র তিনটি পৃথিবীর রূপ রসগন্ধ অনুভব করার আগেই ধরার ধূলায় ঝরে যায়। শিশু বয়সেই তারা তিনজন মারা যান। পুত্র-স্নেহের সৌভাগ্য দিয়ে গেল উম্মতের শিশু সন্তানদের।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জৈষ্ঠ্য পুত্র কাসেমের জন্ম হয় ৬০৭ খৃষ্টাব্দে। মহানবীর বয়স তখন ৩৭। তার মৃত্যু হয় দু'বছর বয়সের আগেই। তখন তিনি শুধু দাঁড়াতে পারতেন, এক পদ দু'পদ হাটতে পারতেন।

রাসূলুল্লাহ্র উপনাম ছিল আবুল কাসেম। অর্থাৎ কাসেমের পিতা।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ৪০ বছর বয়সে তার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহর জন্ম হয়। এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তখন ভালো করে দাঁড়াতে পারতেননা।

রাসূলুল্লাহর তিন ছেলের সর্ব কনিষ্ঠ ইব্রাহিম। মদিনার কয়েক মাইল দূরে মরুভূমির পরিবেশে তার প্রতিপালন হচ্ছিল। মহানবী তাকে দেখার জন্য পায়ে হেঁটে সেখানে যেতেন। পুত্রকে কোলে তুলে নিতেন, চুমু খেতেন।

রাসুলুল্লাহর (সাঃ) তৃতীয় পুত্র ইব্রাহীমের জন্ম হয় ৯ম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে। রাসুল্লাহর বয়স তখন ৬১। দশম হিজরীর ২৯শে শাওয়াল ১৮ মাস বয়সে হযরত ইব্রাহীম মৃত্যু বরণ করেন। ঐদিন সূর্য্যগ্রহণ হয়েছিল। শিশু ইব্রাহীমের মৃত দেহকে রাসূলুল্লাহ চুমু দিয়েছিলেন এবং অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন।

ইব্রাহীমের মাতা মারিয়া কিবতীয়াকে মিশর রাজ মুকাওকিস রাসূলের দরবারে পাঠিয়েছিলেন হাতিব ইবন আবু বুলতায়া (রাঃ) এর সঙ্গে। রাসূলুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৬ই মুহাররম মারিয়া কিবতীয়া (রাঃ) এর ওফাত হয়।

রাসূলের জৈষ্ঠ্য কন্যা জয়নবের একমাত্র পুত্র আলী কিশোর বয়সে মৃত্যু বরন করেন। মক্কা বিজয়ের পর মক্কা নগরীতে প্রবেশকালে উটের পিঠে রাসুলুল্লাহর সাথে ছিলেন শিশু দৌহিত্র আলী এবং উসামা বিন যায়েদ বিন হারিসা (সাঃ)।

রাসুলুল্লাহর দ্বিতীয় কন্যা রুকায়্যার একমাত্র পুত্র আবদুল্লাহ বসন্ত রোগে মারা যান (৪র্থ হিজরী)। মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পর ৬ বছর বয়সে মারা যান আবদুল্লাহ। রুকাইয়্যার (রাঃ) স্বামী ছিলেন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ)। রাসুলুল্লাহর চতুর্থ কন্যা ফাতিমার তৃতীয় পুত্র মুহসিন শিশুকালে মারা যান।

এ দুনিয়ার শিশুদের কতো কষ্ট হয়। মাছি শিশুকে বিরক্ত করে। মশা রক্ত চুষে নেয়। পিপড়া কামড়ায়। পায়খানা-পেশাবের ঠান্ডায় শিশু পা আছড়ায়। কিন্তু মৃত শিশুতো জান্নাতে আরামে থাকে। মা অন্ততঃ এটুকু নিশ্চিত হতে পারে যে আমার একটি শিশু জান্নাতবাসী হবে।

আমাদের প্রিয়নবী ছয় বছর বয়সে মাতৃহারা এবং জন্মের আগেই পিতৃহারা হন। তাঁর দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়্যা দ্বিতীয় হিজরীতে, জেষ্ঠ্য কন্যা জয়নব ৮ম হিজরীতে এবং ৩য় কন্যা উম্মে কুলসুম নবম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। বিবি ফাতেমার মৃত্যু হয় বিশ্ব নবীর ওফাতের ছয় মাসের মাঝে। নবী করিম (সাঃ) এর প্রথম তিনটি কন্যাই তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন।

ছয়টি পুত্র কন্যার মৃত্যু শোক সহ্য করা যে কোন ব্যক্তির জন্যে অত্যন্ত কঠিন। শিশু সন্তান হারাবার ব্যথা কল্পনা করে অনুভব করা যায়না। যাদের সন্তান মারা গেছে তারাই বুঝতে পারে, এ ব্যথা কত গভীর।

মহানবীর তিন কন্যাই শিশু পুত্র হারাবার হৃদয়-বেদনা সহ্য করেন। তাদের শিশুরা মরেনি বরং মায়েদের জান্নাতে গমণের খোশ-খবরী দেয়ার জন্যে আগেই বেহেস্তে পৌছে যান। গৃহে শিশুদের হৈচৈ শুনে বয়স্করা বিরক্ত হয়। কিন্তু গৃহখালি করে শিশুরা যখন চলে যায়, সে শূন্যতা কী দিয়ে পূরণ করা যাবে? নিজের মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনে এবং অতি কাছে দেখেও মানুষ অতো কাঁদেনা, যতো কাঁদে নিজ শিশুর মৃত্যুতে।

শিশু সন্তান আল্লাহর দান, আল্লাহর দেয়া ফুল। এ ফুল শুকিয়ে গেলে দুঃখ করতে নেই। আল্লাহ্‌র কাছে নতুন ফুল চাইতে হবে। তাঁর ভাডারে উন্নততর ফুলের অভাব নেই। হারানো এবং প্রাপ্তি দুটোতেই আল্লাহর কাছে শুকুর গুজারী করতে হবে।